আল কিয়ামাহ

৭৫

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের اَلْقِيٰمَةِ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়–কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ এ অহীকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহবা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছিল। যে সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারে এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা–হা যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

"আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (আয়াত ১১৪)

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى "আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর

তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত, ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী গ্রহণে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্জের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভূত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানা রকম ফন্দি–ফিকির ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

এ সূরায় আখেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের একেকটি সন্দেহ ও একেকটি আপত্তি ও অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মজবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখেরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোন মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্ম ও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওযর সে পেশ করুক না কেন।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ
الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾
بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهٗ ﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقٰى
مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾

না,[১] আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের। আর না, আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের।[২] মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না?[৩] কেন পারবো না? আমি তো তার আংগুলের জোড়গুলো পর্যন্ত ঠিকমত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।[৪] কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতেও কুকর্ম করতে চায়।[৫] সে জিজ্ঞেস করে, কবে আসবে কিয়ামতের সেদিন?[৬] অতপর চক্ষু যখন স্থির হয়ে যাবে।[৭] চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করে একাকার করে দেয়া হবে।[৮] সেদিন এ মানুষই বলবে, পালাবার স্থান কোথায়? কখ্খনো না, সেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেদিন তোমার রবের সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দেয়া হবে।[৯] বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভাল করে জানে। সে যতই অজুহাত পেশ করুক না কেন।[১০]

১. 'না' শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকেই কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। পরবর্তী বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট করে দেয় যে, আলোচনার বিষয় ছিল কিয়ামত ও আখেরাতের জীবন। আর মক্কার লোকেরা এটি শুধু অস্বীকারই করে আসছিলো না বরং অস্বীকৃতির সাথে সাথে তা নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপও করে আসছিলো। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বর্ণনাভঙ্গি ভাল করে বুঝা যেতে পারে। আপনি যদি শুধু রসূলের সত্যতা অস্বীকার করতে চান তাহলে বলবেন ঃ আল্লাহর কসম রসূল সত্য। "কিন্তু কিছু লোক যদি রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে তবে তার উত্তরে আপনি কথা বলতে শুরু করবেন এভাবে ঃ না, আল্লাহর কসম, রসূল সত্য। এর অর্থ হবে, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি।

২. কুরআন মজীদে মানুষের নফসের তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, একটি 'নফস' মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটির নাম 'নফসে আম্মারা'। দুই, একটি 'নফস' ভুল বা অন্যায় কাজ করলে অথবা ভুল বা অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করলে কিংবা খারাপ নিয়ত রাখলে লজ্জিত হয় এবং সে জন্য মানুষকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। এটির নাম 'নফসে লাউয়ামাহ'। আধুনিক পরিভাষায় একেই আমরা বিবেক বলে থাকি। তিন, যে নফসটি সঠিক পথে চললে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে তাকে বলে 'নফসে মুত্মাইন্নাহ'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কি কারণে কিয়ামতের দিন এবং তিরস্কারকারী নফসের কসম করেছেন তা বর্ণনা করেননি। কারণ পরবর্তী আয়াতটি সে বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করছে। যে জন্য কসম করা হয়েছে তাহলো, মানুষের মরার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। এখন প্রশ্ন হলো এ বিষয়টির জন্য এ দু'টি জিনিসের কসম করার পেছনে কি যৌক্তিকতা আছে?

কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার কারণ হলো, কিয়ামতের আগমন নিশ্চিত ও অনিবার্য। গোটা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করছে যে, এ ব্যবস্থাপনা অনাদী ও অন্তহীন নয়। এর বৈশিষ্ট ও প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এটা চিরদিন ছিল না এবং চিরদিন থাকতেও পারে না। মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধি এ ভিত্তিহীন ধ্যান–ধারণার সপক্ষে ইতিপূর্বেও কোন মজবুত দলীল–প্রমাণ খুঁজে পায়নি যে, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এ পৃথিবী কখনো অনাদি ও অবিনশ্বর হতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে এ বিষয়টি তার কাছে ততই নিশ্চিত হতে থাকে যে, এ চাঞ্চল্য মুখর বিশ্ব– জাহানের একটি শুরু বা সূচনা বিন্দু আছে যার পূর্বে এটি ছিল না। আবার অনিবার্যরূপে এর একটি শেষও আছে যার পরে এটি আর থাকবে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিয়ামতেরই কসম করেছেন। এ কসমটির ধরন এরূপ যেমন আমরা অতিশয় সন্দেহবাদী কোন মানুষকে—যে তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ করছে—সম্বোধন করে বলি ঃ তোমার প্রাণ সত্তার কসম, তুমি তো বর্তমান। অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বই সাক্ষী যে তুমি আছ।

কিয়ামতের দিনের কসম শুধু এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, একদিন বিশ্ব–জাহানের এ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাকে

নিজের সমস্ত কাজের হিসেবে দিতে হবে এবং সে নিজের কৃতকর্মের ভাল বা মন্দ ফলাফল দেখবে। এর জন্য পুনরায় 'নফসে লাউয়ামার" কসম করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে বিবেক বলে কোন জিনিস নেই। এ বিবেকের মধ্যে অনিবার্যরূপে ভাল এবং মন্দের একটি অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষ ভাল এবং মন্দ যাঁচাইয়ের যে মানদণ্ডই স্থির করে থাকুক না কেন এবং তা ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, চরম অধঃপতিত ও বিভ্রান্ত মানুষের বিবেকও মন্দ কাজ করলে কিংবা ভাল কাজ না করলে তাকে তিরস্কার করে। এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ নিছক একটি জীব নয়, বরং একটি নৈতিক সত্তাও .বটে। প্রকৃতিগতভাবেই তার মধ্যে ভাল এবং মন্দের উপলব্ধি বিদ্যমান। সে নিজেই ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। সে অন্যের সাথে যখন কোন খারাপ আচরণ করে তখন সে ব্যাপারে নিজের বিবেকের দংশনকে দমন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও অন্য কেউ যখন তার সাথে একই আচরণ করে তখন আপনা থেকেই তার বিবেক দাবী করে যে, এ ধরনের আচরণকারীর শাস্তি হওয়া উচিত। এখন কথা হলো, মানুষের নিজ সত্তার মধ্যেই যদি এ ধরনের একটি 'নফসে লাউওয়ামা' বা তিরস্কারকারী বিবেকের উপস্থিতি একটি অনস্বীকার্য সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সত্যটিও অনস্বীকার্য যে, এ 'নফসে লাউয়ামা'ই মৃত্যুর পরের জীবনের এমন একটি প্রমাণ যা মানুষের আপন সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। কেননা যেসব ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য মানুষ দায়ী সেসব কাজের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন ছাড়া আর কোনভাবেই তার এ দাবী পূরণ হতে পারে না। মৃত্যুর পরে মানুষের সত্তা যদি বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তার অনেক ভাল কাজের পুরস্কার থেকে সে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত থেকে যাবে। আবার এমন অনেক মন্দ কাজ আছে যার ন্যায্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না। অযৌক্তিক একটি বিশ্বে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জন্মলাভ করে বসেছে এবং নৈতিক উপলব্ধি সম্পন্ন মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বসেছে মৌলিকভাবে যার পুরা ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার কোন অস্তিত্বই নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এ অর্থহীন ও অযৌক্তিক কথাটি স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না। একইভাবে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদী দর্শন প্রকৃতির এ দাবীর যথার্থ জবাব নয়। কারণ মানুষ যদি নিজের নৈতিক কাজ-কর্মের পুরস্কার বা শাস্তিলাভের জন্য একের পর এক এ পৃথিবীতে জন্ম নিতে থাকে তাহলে প্রত্যেক জন্মে সে পুনরায় আরো কিছু নৈতিক কাজ-কর্ম করতে থাকবে যা নতুন করে পুরস্কার বা শাস্তির দাবী করবে। আর এ অন্তহীন ধারাবাহিকতার ঘূর্ণিপাকে পড়ে তার হিসেব-নিকেশের কোন ফায়সালা হবে না। বরং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রকৃতির এ দাবী কেবল একটি অবস্থায়ই পূরণ হতে পারে। তা হলো, এ পৃথিবীতে মানুষের একটি মাত্র জীবন হবে এবং গোটা মানব জাতির আগমনের ধারা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটি জীবন হবে। সে জীবনে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম যথাযথভাবে হিসেব-নিকেশ করে তাকে তার প্রাপ্য পুরো পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০)

৩. কসম আকারে ওপরে বর্ণিত দু'টি দলীল শুধু দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। এক, এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি (অর্থাৎ কিয়ামতের প্রথম পর্যায়) একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

দুই, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা ছাড়া মানুষের একটি নৈতিক সত্তা হওয়ার যৌক্তিক ও প্রকৃতিগত দাবী পূরণ হতে পারে না। আর এ ব্যাপারটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক থাকাটাই তা প্রমাণ করে। মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব একথা প্রমাণ করার জন্যই এ তৃতীয় দলীলটি পেশ করা হয়েছে। মক্কার যেসব লোক মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করতো তারা বার বার একথা বলতো যে, যেসব লোকের মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু মাটিতে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের হাড়গোড় পচে গলে পৃথিবীর কত জায়গায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার কোন হদিস নেই, যাদের কেউ মরেছে আগুনে পুড়ে, কেউ হিংস্র জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ সমুদ্রে ডুবে মাছের খোরাক হয়েছে তাদের সবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবার একত্র হবে এবং প্রতিটি মানুষ আবার হুবহু সে মানুষটি হয়ে জীবনলাভ করবে, যে মানুষটি দশ-বিশ হাজার বছর আগে কোন এক সময় ছিল, এটা কি করে সম্ভব? মক্কার লোকদের এসব কথার জবাব আল্লাহ তা'আলা একটি ছোট প্রশ্নের আকারে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও বলিষ্ঠভাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ "মানুষ কি মনে করছে যে, আমি তার হাড়গোড় আদৌ একত্রিত করতে পারবো না"? অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে বলা হতো, তোমাদের দেহের বিক্ষিপ্ত এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন এক সময় আপনা থেকেই একত্রিত হয়ে যাবে এবং তোমরাও আপনা থেকেই হুবহু এই দেহ নিয়েই জীবিত হয়ে যাবে তাহলে এরূপ হওয়াটাকে অসম্ভব মনে করা তোমাদের জন্য নিসন্দেহে যুক্তিসংগত হতো। কিন্তু তোমাদের তো বলা হয়েছে এ কাজটি আপনা থেকেই হবে না। বরং তা করবেন আল্লাহ তা'আলা নিজে। তাহলে কি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই মনে করো যে, সারা বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা—যাকে তোমরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে থাকো—এ কাজ করতে অক্ষম? এটি এমন একটি প্রশ্ন যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা বলে স্বীকার করে, সে যুগেও তারা বলতে পারতো না এবং বর্তমান যুগেও বলতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন না। আর কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলেও ফেলে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তুমি আজ যে দেহের অধিকারী তার অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাতাস, পানি, মাটি এবং অজ্ঞাত আরো কত জায়গা থেকে এনে একত্রিত করে সে আল্লাহ এ দেহটি কিভাবে তৈরী করলেন যার সম্পর্কে তুমি বলছো যে, তিনি পুনরায় এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করতে সক্ষম নন?

৪. অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম যেমন তা এর আগে ছিল।

৫. এ ছোট বাক্যটিতে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের আসল রোগ কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যেসব জিনিস এসব লোককে আখেরাত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করতো তা মূলত এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কিয়ামত ও আখেরাতকে অসম্ভব মনে করতো। বরং তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, আখেরাতকে মেনে নিলে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপিত

হয়। সে বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়া তাদের কাছে মোটেই মনঃপূত নয়। তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম–অত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। একদিন তাদেরকে আল্লাহর বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এসব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাস যেন তাদের অবৈধ লাগামহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করতে না পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক–বুদ্ধি তাদেরকে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে না। বরং তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই এ পথের প্রতিবন্ধক।

৬. এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে জানার জন্যে নয়। বরং তা অস্বীকৃতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন অর্থাৎ কিয়ামত কবে আসবে তা জানতে চায়নি তারা। বরং তারা একথা বলছিলো বিদ্রূপ করে যে, জনাব, আপনি যে দিনটির আসার খবর দিচ্ছেন তা আসার পথে আবার কোথায় আটকে রইলো?

৭. মূল আয়াতে برق البصر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে একথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয়। বরং ভীতি–বিহবলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির–নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। একথাটিই কুরআন মজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।" (সূরা ইবরাহীম, ৪২)

৮. এটা কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ে বিশ্ব–জাহানের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ এও হতে পারে যে, সূর্য থেকে প্রাপ্ত চাঁদের আলোই শুধু ফুরিয়ে যাবে না। বরং সূর্য নিজেও অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আলোহীন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থা হবে একই। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, হঠাৎ পৃথিবী উল্টা দিকে চলতে শুরু করবে এবং সেদিন চাঁদ ও সূর্য একই সাথে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এর তৃতীয় আরেকটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, চাঁদ অকস্মাত পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে এবং সূর্যের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। এ ছাড়া এর আরো কোন অর্থ হতে পারে যা বর্তমানে আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. মূল বাক্যটি হলো بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ । এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বদ কাজ করে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

হে নবী,[১১] এ অহীকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব। তাই আমি যখন তা পড়ি[১২] তখন এর পড়া মনযোগ দিয়ে শুনবে। অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।[১৩] কখ্খনো না[১৪] আসল কথা হলো, তোমরা দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ দুনিয়া) ভালবাস এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করে থাক।[১৫] সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে।[১৬] নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।[১৭] আর কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে উদাস–বিবর্ণ।

সামনে পেশ করা হবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, তার যা কিছু করা উচিত ছিল অথচ সে তা করেনি আর যা কিছু করা উচিত ছিল না অথচ সে তা করেছে তাও সব তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। তৃতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। চতুর্থ অর্থ হলো, যেসব ভাল বা মন্দ কাজ সে করেছে তাও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যেসব ভাল বা মন্দ কাজ করা থেকে সে বিরত থেকেছে তাও তাকে অবহিত করা হবে।

১০. মানুষের সামনে তার আমলনামা পেশ করার উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা নয়। বরং এরূপ করা জরুরী এই কারণে যে, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। প্রত্যেক মানুষই জানে, সে নিজে কি? সে কি, একথা তাকে অন্য কারো বলে দিতে হয় না। একজন মিথ্যাবাদী গোটা দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে একথা জানে যে, সে যা বলছে তা মিথ্যা। একজন চোর তার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য অসংখ্য কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে যে চোর তা তার নিজের কাছে গোপন থাকে না। একজন পথভ্রষ্ঠ লোক হাজারো প্রমাণ পেশ করে মানুষকে একথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে যে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের সমর্থক তা তার মনের বিশ্বাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার নিজের বিবেক একথা ভাল করেই জানে যে, সে ঐ সব আকীদা–বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে কেন এবং তার মধ্যকার ভুল বুঝতে ও মেনে নিতে কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে? জালেম, অসচ্চরিত্র, দুষ্কর্মশীল এবং হারামখোর মানুষ নিজের অপকর্মের পক্ষে নানা রকম ওজর–আপত্তি ও কৌশল পেশ করে নিজের বিবেকের মুখ পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে যাতে বিবেক তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সত্যিকারভাবেই কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ এবং কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে সে এসব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় তার এটা জানা থাকে যে,

সে কার প্রতি কতটা জুলুম করেছে, কার হক মেরে খেয়েছে, কার সতীত্ব নষ্ট করেছে, কাকে প্রতারণা করেছে এবং কোন্ অবৈধ পন্থায় কি কি স্বার্থ উদ্ধার করেছে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

১১. এখান থেকে শুরু করে "এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব" কথাটি পর্যন্ত পুরা বাক্যটি একটি ভিন্ন প্রসংগের বাক্য, যা মূল কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। আমরা সূরার ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে—যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করার অভ্যাস পুরোপুরি রপ্ত হয়নি—যখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো তখন তিনি আশংকা করতেন যে, আল্লাহর যে বাণী জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে শুনাচ্ছেন তা হয়তো তিনি ঠিকমত স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারবেন না। তাই অহী শোনার সাথে সাথে তিনি তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন সূরা কিয়ামার এ আয়াতগুলো তাঁকে শুনাচ্ছিলেন তখনও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে বলা হয় যে, আপনি অহীর কথা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না, বরং গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনতে থাকুন। তা স্মরণ করানো এবং পরবর্তী সময়ে আপনাকে তা পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বাণীর একটি শব্দও আপনি ভুলবেন না এবং তা উচ্চারণ করা বা পড়ার ব্যাপারে আপনার কোন ভুল হবে না। এ নির্দেশনামা দেয়ার পর পুনরায় মূল কথার ধারাবাহিকতা "কখনো না, আসল কথা হলো" কথাটি দ্বারা শুরু হয়েছে। যারা এ পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় তারা এখানে এ বাক্যাংশ দেখে মনে করে যে, এখানে একথাটি একেবারেই খাপ ছাড়া। কিন্তু এ পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কথার মধ্যে কোন অসংলগ্নতা আছে বলে মনে হয় না। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়, একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় হঠাৎ দেখলেন যে, তাঁর ছাত্রের মন অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট। তাই তিনি পাঠ দানের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে বললেন ঃ "আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোন।" এরপর তিনি পুনরায় নিজের কথা শুরু করলেন। এ পাঠ দান যদি হুবহু ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে যেসব লোক এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন তারা বক্তৃতার ধারাবাহিকতার মধ্যে একথাটাকে খাপছাড়া মনে করবেন। কিন্তু যে কারণে একথাটি বাক্যের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে যে ব্যক্তি সে আসল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, পাঠ দানের বক্তব্যটি আসলে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা বর্ণনা বা উদ্ধৃত করতে কোন প্রকার কমবেশী করা হয়নি।

এসব আয়াতের মাঝখানে এ বাক্যাংশটির অপ্রাসঙ্গিকভাবে আনারও যে কারণ আমরা ওপরে বিশ্লেষণ করেছি তা শুধু অনুমান নির্ভর নয়। বরং নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহে তার এ একই কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী এবং অন্যসব মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল হতো তখন পাছে তিনি ভুলে যান এ ভয়ে

জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে কথাগুলো বার বার আওড়াতে থাকতেন। তাই বলা হয়েছে.......... لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ শা'বী, ইবনে যায়েদ, দ্বাহ্হাক, হাসান বাসরী, কাতাদা, মুজাহিদ এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্‌সির থেকেও একথাটিই উদ্ধৃত হয়েছে।

১২. জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা শুনাতেন না, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পড়ে শুনাতেন। তাই একথাটিও আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন ঃ "যখন আমি তা পাঠ করতে থাকবো।"

১৩. এ থেকে ধারণা জন্মে যে, সম্ভবত নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগেই অহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন আয়াত অথবা কোন শব্দ অথবা কোন বিষয়ের অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তাই তাঁকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়নি যে, যখন অহী নাযিল হতে থাকবে তখন নিরবে তিনি তা শুনবেন, কিংবা শুধু এ নিশ্চয়তা ও সান্ত্বনাই দেয়া হয়নি যে, অহীর প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে অবিকল সংরক্ষিত করে দেয়া হবে এবং কুরআনকে তিনি ঠিক সেভাবে পাঠ করতে সক্ষম হবেন যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। বরং সাথে সাথে তাঁকে প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীর মর্ম এবং উদ্দেশ্যও তাঁকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এ আয়াত দ্বারা এমন কয়েকটি মৌলিক বিষয় প্রমাণিত হয়, যা কোন ব্যক্তি ভালভাবে বুঝে নিলে এমন কিছু গোমরাহী থেকে রক্ষা পেতে পারে যা ইতিপূর্বেও কিছুলোক ছড়িয়েছে এবং বর্তমানেও ছড়াচ্ছে।

প্রথমত, এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুরআনে লিপবদ্ধ অহী-ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হতো না। বরং এ অহী ছাড়াও তাঁর প্রতি আরো অহী নাযিল হতো এবং সে অহীর মাধ্যমে তাঁকে এমন জ্ঞান দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ নেই। তাই কুরআনের হুকুম-আহকাম ও নির্দেশাবলী, তার ইংগিত, তার শব্দমালা এবং তার বিশেষ পরিভাষার যে অর্থ ও মর্ম নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হতো তা যদি কুরআনের মধ্যেই সংযোজিত থাকবে তাহলে একথা বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, তার অর্থ বুঝিয়ে দেয়া বা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেয়া আমারই দায়িত্ব। কারণ এমতাবস্থায় তা আবার কুরআনের মধ্যেই পাওয়া যেতো। অতএব, একথা মানতে হবে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের শব্দমালা বহির্ভূত অন্য কিছু। এটা "অহীয়ে খফীর" আরো একটি প্রমাণ যা খোদ কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। (কুরআন মজীদ থেকে এর আরো প্রমাণ আমি আমার "সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত" গ্রন্থের ৯৪-৯৫ এবং ১১৮ থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছি।)

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের অর্থ ও মর্ম এবং হুকুম-আহকামের যে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তা তো এ জন্যই দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তদনুযায়ী নিজের কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে কুরআন

বুঝিয়ে দেবেন এবং তার আদেশ–নিষেধ অনুযায়ী কাজ করা শেখাবেন। একথার মর্ম ও অর্থ যদি তা না হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি শুধু এ জন্য এ ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়ে থাকে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কাছেই সে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখবেন তাহলে এটা হতো একটা অর্থহীন কাজ। কারণ, নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তা থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যেতো না। সুতরাং কোন নির্বোধই কেবল একথা বলতে পারে যে, ব্যাখ্যামূলক এ জ্ঞানের শরীয়াতের বিধান রচনার ক্ষেত্রে আদৌ কোন ভূমিকা ছিল না। সূরা 'নাহ্‌লের" ৪৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

"হে নবী, আমি তোমার কাছে এ 'যিকর' নাযিল করেছি এ জন্য, যেন তুমি মানুষের জন্য নাযিলকৃত শিক্ষার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করতে থাকো।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহ্‌ল, টীকা ৪০)

কুরআন মজীদের চারটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ শুধু আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়াই ছিল না। বরং এ কিতাবের শিক্ষা দেয়াও ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তরভুক্ত। (আল বাকারাহ, আয়াত ১২৯ ও ১৫১; আলে ইমরান, ১৬৪ এবং আল জুম'আ, ২। আমি 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' গ্রন্থের ৭৪ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠায় এসব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।) এরপর কোন মানুষ কি করে একথা অস্বীকার করতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা–ই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সরকারী ব্যাখ্যা। কেননা, তা তাঁর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর বলে দেয়া ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কিংবা তা পাশ কাটিয়ে যে ব্যক্তিই কুরআনের কোন আয়াতের অথবা কোন শব্দের মনগড়া অর্থ বর্ণনা করে সে এমন ধৃষ্টতা দেখায় যা কোন ঈমানদার ব্যক্তি দেখাতে পারে না।

তৃতীয়ত, কেউ যদি সাধারণভাবেও কুরআন অধ্যয়ন করে থাকে তাহলেও সে দেখবে যে, তাতে এমন অনেক বিষয় আছে একজন আরবী জানা লোক শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্য পড়ে তার অর্থ বা মর্ম উদ্ধার করতে এবং তার মধ্যে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কিভাবে মেনে চলবে তা জানতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে صلوة (সালাত) শব্দটির কথাই ধরুন। কুরআন মজীদে যদি ঈমানের পরে অন্য কোন আমলের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে তবে তা হলো সালাত বা নামায। কিন্তু কেবল আরবী ভাষার সাহায্যে কেউ এর অর্থ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারতো না। কুরআন মজীদে এ শব্দটির বার বার উল্লেখ দেখে কেউ বড়জোর এতটুকু বুঝতে সক্ষম যে, আরবী ভাষার এ শব্দটিকে কোন বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ সম্ভবত এমন কোন বিশেষ কাজ যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য ঈমানদারদের কাছে দাবী জানানো হচ্ছে। কিন্তু শুধু কুরআন পাঠ করে কোন আরবী জানা লোক এ সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবে না যে, সে বিশেষ কাজটি কি এবং কিভাবে তা আঞ্জাম দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন

প্রেরণকারী যদি তাঁর পক্ষ থেকে একজন শিক্ষক নিয়োগ করে এ পারিভাষিক অর্থ তাঁকে যথাযথভাবে না বলে দিতেন এবং 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের পন্থা-পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তাঁকে না শেখাতেন তাহলে দুনিয়াতে দু'জন মুসলমানও এমন পাওয়া যেতো না যারা শুধু কুরআন পাঠ করে 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন একটি পন্থা মেনে নিতে একমত হতে পারতো? দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা যে পুরুষাণুক্রমে একই নিয়ম ও পন্থায় নামায পড়ে আসছে এবং দুনিয়ার আনাচে-কানাচে কোটি কোটি মুসলমান একই নিয়ম-পন্থায় যেভাবে নামাযের হুকুম পালন করছে তার কারণ তো শুধু এই যে, মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্যই নাযিল করেননি। বরং ঐ সব শব্দ এবং বাক্যের অর্থ এবং মর্মও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর যারা তাঁকে আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তিনি সেসব লোককেই এর অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

চতুর্থত, কুরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) বুঝিয়েছেন এবং রসূল (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীস এবং সুন্নাত ছাড়া তা জানার আর কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হাদীস বলতে বুঝায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সনদসহ তৎকালীন লোকদের নিকট থেকে আমাদের কালের লোকদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সুন্নাত বলতে বুঝায় সেসব নিয়ম-কানুনকে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক ও বাস্তব শিক্ষার দ্বারা মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে চালু হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে পরবর্তী লোকেরা লাভ করেছে এবং পরবর্তী যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তা কার্যকর হতে দেখেছে। জ্ঞানের এ উৎসকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে প্রকারান্তরে সে যেন একথাই বলে ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ বলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করতে (না'উযুবিল্লাহ) তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, শুধু রসূলকে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল রসূলের মাধ্যমে উম্মতকে আল্লাহর কিতাবের অর্থ বুঝানো। হাদীস ও সুন্নাত আইনের উৎস একথা অস্বীকার করলে আপনা থেকেই তার অনিবার্য অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। না'উযুবিল্লাহ! এর জবাবে যারা বলে যে, অনেক লোক তো মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিল, তাকে আমরা বলবো, মিথ্যা হাদীস রচনা করাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে গোটা মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজকে আইনের মর্যাদা দান করতো। তা না হলে গোমরাহী বিস্তারকারীদের মিথ্যা হাদীস রচনার প্রয়োজন হবে কেন? মুদ্রা জালকারীরা কেবল সে মুদ্রাই জাল করে যা বাজারে চালু থাকে। বাজারে যেসব নোটের কোন মূল্য নেই কে এমন নির্বোধ আছে যে, সেসব নোট জাল করে ছাপাবে? তাছাড়াও এ ধরনের কথা যারা বলে তারা হয়তো জানে না যে, যে পবিত্র সত্তার (সা) কথা ও কাজ আইনের মর্যাদা সম্পন্ন তাঁর সাথে যাতে কোন মিথ্যা কথা সম্পর্কিত হতে না পারে প্রথম দিন থেকেই মুসলিম উম্মাহ গুরুত্বসহ সে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ পবিত্র

সত্তার (সা) প্রতি কোন মিথ্যা কথা আরোপের আশংকা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এ উম্মতের কল্যাণকামীরা তত অধিক মাত্রায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য। সত্য ও মিথ্যা হাদীস পৃথকীকরণের এ জ্ঞান এমন একটি অত্যুচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান যা একমাত্র মুসলিম জাতি ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কেউ আবিষ্কার করেনি। যারা এ জ্ঞান অর্জন না করেই শুধু মাত্র পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রতারণা ও প্রলোভনের শিকার হয়ে হাদীস ও সুন্নাতকে অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করে এবং একথাও জানে না যে, তারা তাদের এ মূর্খতানির্ভর ধৃষ্টতা দ্বারা ইসলামের কত মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। তারা আসলেই বড় হতভাগা।

১৪. মাঝে'র অপ্রাসংগিক কথাটির আগে বক্তব্যের যে ধারাবাহিকতা ছিল এখানে এসে আবার সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। কখখনো না, অর্থ হলো, তোমাদের আখেরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিকর্তা কিয়ামত সংঘটিত করতে কিংবা মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আবার জীবিত করতে পারবেন না বলে তোমরা মনে করো বরং আসল কারণ হলো এটি।

১৫. এটি আখেরাতকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণটি ৫নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণটি হলো, মানুষ যেহেতু অবাধে পাপাচার চালাতে চায় এবং আখেরাতকে মেনে নিলে অনিবার্যরূপে যেসব নৈতিক বিধিবন্ধন মেনে চলার দায়িত্ব বর্তায় তা থেকে বাঁচতে চায়। তাই তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আখেরাতকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার এ অস্বীকৃতিকে যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করার জন্য সে সুন্দর করে সাজিয়ে যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করে। এখন দ্বিতীয় কারণটি বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেহেতু সংকীর্ণমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ, তা যদি তারা লাভ করে তাহলে যেন সবকিছুই তারা পেয়ে গেল। এতে আখেরাতে তাদের পরিণাম যত খারাপই হোক না কেন। একইভাবে তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, যে ক্ষতি, কষ্ট বা দুঃখ–বেদনা এখানে হবে তা থেকে মূলত নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেখার দরকার নেই যে, তা বরদাশত করে নিলে আখেরাতে তার বিনিময়ে কত বড় পুরস্কার লাভ করা যাবে। তারা চায় নগদ সওদা। আখেরাতের মত বহু দূরের জিনিসের জন্য তারা আজকের কোন স্বার্থ যেমন ছাড়তে চায় না তেমনি কোন ক্ষতিও বরদাশত করতে পারে না। এ ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে যখন তারা আখেরাত সম্পর্কে যৌক্তিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তখন আর তা খাঁটি যুক্তিবাদ থাকে না। বরং তখন তার পেছনে এ ধ্যান–ধারণাটিই কাজ করতে থাকে। আর সে কারণে সর্বাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত এটাই থাকে যে, আখেরাতকে মানা যাবে না। যদিও ভেতর থেকে তার বিবেক চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার অনিবার্যতা সম্পর্কে কুরআনে যেসব দলীল–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত আর তার বিপক্ষে যেসব যুক্তি তারা দেখাচ্ছে তা অত্যন্ত ভোঁতা ও অন্তসার–শূন্য।

১৬. অর্থাৎ খুশীতে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ, তারা যে আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল তা হুবহু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চোখের সামনে বিদ্যমান থাকবে। যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ স্বার্থ পরিত্যাগ করেছিল এবং সত্যিকার অর্থেই ক্ষতি স্বীকার করেছিল তা চোখের সামনে বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা নিজেদের জীবনাচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন তার সর্বোত্তম ফলাফল দেখার সময় এসে গেছে।

১৭. মুফাস্‌সিরগণের কেউ কেউ একথাটিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন ঃ "কারো প্রতি তাকিয়ে থাকা" কথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে তার কাছে কোন কিছু আশা করা, তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা এবং তার দয়া প্রার্থী হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি অন্ধ ব্যক্তিও অনেক সময় বলে যে, আমি তো অমুকের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আমার জন্য কি করেন তা দেখার জন্য। কিন্তু বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে ঃ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।" মুসলিম এবং তিরমিযীতে হযরত সুহাইব থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপূর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের 'রবের' সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে ঃ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ অর্থাৎ "যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে।" (ইউনুস, ২৬) বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বললো 'না।' তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের রবকে এ রকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ের প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, দারকুতনী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে আবী শায়বা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার বিষয়বস্তু হলো, জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিও দুই হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখতে পাবে এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি প্রতিদিন দুই বার তার রবকে দেখতে পাবে। একথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, 'সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে। নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।' ইবনে মাজাতে হযরত

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি তাকাবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি তাকাবে। অতপর যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অন্তর্হিত না হবেন ততক্ষণ তারা জান্নাতের কোন নিয়ামতের প্রতি মনযোগ দেবে না এবং আল্লাহর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। এটি এবং অন্য আরো বহু হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ "কখ্খনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ) সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে।" (আল মুতাফ্ফিফীন, ১৫) এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য, নেক্কারদের জন্য নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো, মানুষের পক্ষে আল্লাহকে দেখা কিভাবে সম্ভব? কোন জিনিসকে দেখ্তে পাওয়ার জন্য যা অনিবার্যরূপে প্রয়োজন তাহলো, সে জিনিসটিকে কোন বিশেষ দিক, স্থান, আকৃতি ও বর্ণ নিয়ে সামনে বিদ্যমান থাকতে হবে। আলোক রশ্মি তাতে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ওপর পড়বে এবং চোখ থেকে তার ছবি বা প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছবে। মানুষের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র সত্তাকে এভাবে দেখতে পওয়ার কল্পনাও কি করা যায়? কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন মূলত একটি বড় ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। একটি হলো, দেখার তাৎপর্য। আর অপরটি হলো দেখার কাজটি সংঘটিত হওয়ার সেই বিশেষ অবস্থা বা প্রক্রিয়াটি যার সাথে আমরা এ পৃথিবীতে পরিচিত। দেখার তাৎপর্য হলো, দর্শনকারী ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ সে অন্ধ হবে না। দৃশ্যমান বস্তু তার কাছে স্পষ্ট হবে, অদৃশ্য বা চোখের আড়াল হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা যে জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করি বা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকি তা দেখার সে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় যার সাহায্যে কোন মানুষ বা পশু কার্যত কোন জিনিসকে দেখে থাকে। এ জন্য অনিবার্যরূপে যা প্রয়োজন তা হলো, দর্শনকারীর দেহে চোখ নামক একটি অংগ থাকবে। সে অংগটিতে দেখার শক্তি বর্তমান থাকবে। তার সামনে একটি সসীম রঙিন বা বর্ণময় দেহ বিদ্যমান থাকবে যা থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের পর্দার ওপর পড়বে এবং চোখের পর্দায় তার আকৃতির স্থান সংকুলান হতে হবে। এখন যদি কেউ মনে করে যে, দেখতে পাওয়ার মূলে এ দুনিয়াতে যে প্রক্রিয়াটি কার্যকর বলে আমরা জানি শুধু সে প্রক্রিয়াতেই দেখার কাজটি কার্যত প্রকাশ পেতে বা ঘটতে পারে তাহলে তা তার নিজের মন-মগজ তথা ধী-শক্তির সংকীর্ণতা। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার নিজের সাম্রাজ্যে দেখার জন্য এত অসংখ্য উপায় ও প্রক্রিয়া থাকা সম্ভব যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এ প্রশ্ন নিয়ে যে ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয় সে নিজেই বলুক, তার রব চক্ষুষ্মান না অন্ধ? তিনি যদি চক্ষুষ্মান তথা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন এবং গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার প্রতিটি বস্তু দেখে থাকেন তাহলে কি তিনি চোখ নামের একটি অংগ দিয়ে দেখছেন যা দিয়ে দুনিয়ায় মানুষ ও অন্য সব জীবজন্তু দেখে থাকে এবং আমাদের দ্বারা যেভাবে দেখার কাজটা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর দ্বারাও কি সেভাবেই সংঘটিত হচ্ছে? সবারই জানা যে, এর জবাব হবে নেতিবাচক। এর জবাব যখন নেতিবাচক, তখন কোন বিবেক ও বোধ সম্পন্ন মানুষের একথা বুঝতে কষ্ট হবে কেন যে, দুনিয়ায় মানুষ যে নির্দিষ্ট

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيْلَ مَنْ ﵣ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হবে। কখ্খনো না,[১৮] যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে উপনীত হবে এবং বলা হবে, ঝাঁড় ফুঁক করার কেউ আছে কি?[১৯] মানুষ বুঝে নেবে এটা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়। উভয় পায়ের গোছা বা নলা একত্র হয়ে যাবে।[২০] সেদিনটি হবে তোমার প্রভুর কাছে যাত্রা করার দিন।

প্রক্রিয়ায় কোন জিনিসকে দেখে থাকে জান্নাতবাসীগণ সে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন না। বরং সেখানে দেখার ধরন, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া হবে অন্য রকম যা এখানে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দাম্পত্য জীবন কি এবং কেমন একটি দুই বছরের শিশুর পক্ষে তা বুঝা যতটা কঠিন, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের সবকিছু সঠিকভাবে বুঝা আমাদের জন্য তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। অথচ যৌবনে উপনীত হয়ে এ শিশু নিজেই দাম্পত্য জীবন যাপন করবে।

১৮. এ 'কখ্খনো না' কথাটি সেই ধারাবাহিক কথাটির সাথে সম্পৃক্ত যা আগে থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভুল যে, তোমরা মরে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং নিজ প্রভুর সামনে তোমাদের ফিরে যেতে হবে না।

১৯. মূল আয়াতে رَاقٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি رُقْيَة ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ তাবীজ–কবচ এবং ঝাড়–ফুঁক। আবার رُقِى ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ ওপর দিকে ওঠা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহলো, শেষ মুহূর্তে যে সময় রোগীর সেবা শুশ্রূসাকারীরা সব রকমের ওষুধ পত্র সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে ঃ আরে, কোন ঝাড় ফুঁককারীকেই অন্তত খুঁজে আনো যে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তা হলো, সে সময় ফেরেশতারা বলবে ঃ কে এ রূহটা নিয়ে যাবে? আযাবের ফেরেশতারা না রহমতের ফেরেশতারা? অন্য কথায় সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি আখেরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা করছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। অসৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়াবে না। আযাবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।

২০. তাফসীরকারদের অনেকেই سَاق (পায়ের নলা) শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ হিসেবে কথাটির অর্থ হয় মরার সময় যখন পা শুকিয়ে একটি আরেকটির সংগে লেগে যাবে। আবার কেউ কেউ প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে শব্দটিকে কঠোরতা, রূঢ়তা ও বিপদাপদ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সে সময় দু'টি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে পরকালীন জগতে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰٓى أَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

২ রুকূ'

কিন্তু সে সত্যকে অনুসরণও করেনি। নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছে।[২১] *এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই। হাঁ, এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।*[২২]

মানুষ[২৩] *কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?*[২৪] *সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়। অতপর তা মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার অংগ-প্রত্যংগগুলো সুসামঞ্জস্য করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু' রকম মানুষ বানালেন। সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?*[২৫]

২১. অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আখেরাতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না সে পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সবকিছু শোনার পরেও তা অস্বীকার করে যেতে থাকলো এবং এসব আয়াত শোনার পর দর্প ভরে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে যায়েদের মতে এ লোকটি ছিল আবু জেহেল। আয়াতের শব্দসমূহ থেকেও এটাই প্রকাশ পায় যে, সে এমন কোন ব্যক্তি ছিল যে সূরা কিয়ামার ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো শোনার পর এ আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

এ আয়াতের "সে সত্যকে অনুসরণও করেনি, নামাযও পড়েনি" কথাটি বিশেষভাবে মনযোগলাভের যোগ্য। এর থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার পর তার প্রাথমিক এবং অনিবার্য দাবী হলো, মানুষ যেন নামায পড়ে। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের অন্য সব হুকুম-আহকাম তামীল করার পর্যায় বা অবকাশ তো আসে আরো পরে। কিন্তু ঈমান আনার পর কিছু সময় যেতে না যেতেই নামাযের সময় এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় সে যা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার মুখ

থেকে উচ্চারণ করেছিল তা সত্যিই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, না কি কয়েকটি শব্দের আকারে মুখ থেকে উচ্চারিত ফাঁকা বুলি মাত্র।

২২. তাফসীরকারগণ أَوْلَىٰ لَكَ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ঠিক তোমাকে! সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! তবে বাক্যটির অবস্থান বিবেচনা করলে আমার মতে এর দু'টি উপযুক্ত অর্থ হতে পারে যা হাফেয ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ "তুমি যখন তোমার সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছো তখন তোমার মত মানুষের পক্ষে এ আচরণই শোভা পায় যা তুমি করছো।" এটি একটি শ্লেষ বাক্য। কুরআন মজীদের আরো এক জায়গায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দোযখে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবে ঃ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ "নাও, এর মজা চাখো। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।" (আদ দুখান, ৪৯)

২৩. এখানে বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে সেই একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন অনিবার্যও এবং তা সম্ভবও।

২৪. আরবী ভাষায় ابل سدى বলা হয় এমন উটকে যা বেঁধে রাখা হয় না, উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, এবং তার খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ থাকে না। লাগামহীন উট বলে আমরা এ অর্থটিই প্রকাশ করে থাকি। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে লাগামহীন উট মনে করে যে, তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? তার কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই? কোন জিনিস তার জন্য নিষিদ্ধ নয়? আর এমন কোন সময়ও কি তার আসবে না যখন তাকে তার কাজ-কর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? একথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" (আল মু'মিনূন, ১১৫)

এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, তোমরা কি প্রকৃতই নিজেদেরকে নিছক পশু বলে মনে করে নিয়েছো? তোমরা কি তোমাদের ও পশুদের মধ্যে এ স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাও না যে, পশুদের কোন ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তোমাদের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে? পশুর কাজ-কর্মে নৈতিক ভাল-মন্দের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু তোমাদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অনিবার্যরূপে ওঠে। এসব সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের ব্যাপারে কি করে মনে করতে পারলে যে, পশুরা যেমন দায়িত্বমুক্ত, তাদের যেমন কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তোমাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই? পশুদের পুনরায় জীবিত করে না উঠানোর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বুঝা যায়। তারা তাদের সহজাত ও প্রকৃতিগত ধরাবাঁধা দাবী পূরণ করেছে মাত্র। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কোন দর্শন রচনা করেনি, কোন

বিশেষ মত ও পথের অনুসারী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেনি, কাউকে উপাস্য বানায়নি এবং নিজেও কারো উপাস্য হয়নি, এমন কোন কাজ করেনি যাকে নেক্‌কাজ বা বদকাজ বলে অভিহিত করা যায়। কোন ভাল বা মন্দ রীতি–প্রথার প্রচলন করেনি যার প্রভাব পুরুষাণুক্রমে চলেছে এবং সে জন্য সে পুরস্কার বা শাস্তিলাভের উপযুক্ত। তাই তারা যদি মরার পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে সেটা বোধগম্য ব্যাপার। কারণ তার ওপর কোন কাজের দায়–দায়িত্ব বর্তায় না যে, তার জবাবদিহির জন্য পুনরায় তাকে জীবিত করে উঠানোর প্রয়োজন হবে। কিন্তু তোমাদেরকে মৃত্যুর পরের জীবন থেকে কিভাবে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে? কারণ মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তোমরা এমন সব নৈতিক কাজ–কর্ম করতে থাকো যার ভাল বা মন্দ হওয়া এবং পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের বিবেক–বুদ্ধিই সিদ্ধান্ত দেয়। যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এবং পরক্ষণেই আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তোমাদের মতে কি তার অবাধে (Scotfree) বেঁচে যাওয়া এবং এ জুলুমের প্রতিফল কোন দিনই না পাওয়া উচিত? যে ব্যক্তি দুনিয়ায় এমন কোন বিপর্যয়ের বীজ বপন করে গিয়েছে মানব সন্তানেরা শত শত বছর ধরে যার বিষময় ফল ভোগ করলো বা দুর্ভোগ পোহালো সে–ও নগণ্য পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গের মত মৃত্যুর পর বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, যার কৃতকর্মের ফলে হাজার হাজার ও লাখ লাখ মানুষের জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছে পুনরায় জীবিত হয়ে তাকে সেসব কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে না হোক এরূপ ব্যবস্থায় কি তোমাদের বুদ্ধি–বিবেক সত্যিই সন্তুষ্ট হতে পারবে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জীবন ব্যাপী হক ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার জন্য নিজের জীবনপাত করলো এবং জীবনভর শুধু বিপদ–মুসিবতই পোহালো তোমাদের বিবেচনায় কি সে পোকা–মাকড় ও কীট–পতঙ্গের মতই কোন নগণ্য সৃষ্টি, যার নিজের ভালকাজের পুরস্কার লাভের কোন অধিকারই নেই?

২৫. এটি মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। যারা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বীর্য দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা পর্যন্ত গোটা কাজটাই মহান আল্লাহর শক্তি ও কৌশলের একটা বিস্ময়কর নমুনা, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এ প্রমাণের কোন জবাব নেই। কেননা, তারা যতই ঔদ্ধত্য দেখাক না কেন তাদের বিবেক–বুদ্ধি একথা না মেনে পারে না যে, যে আল্লাহ এভাবে দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি পুনরায় এ মানুষকে অস্তিত্ব দান করতেও সক্ষম। তবে যারা এ স্পষ্ট জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত কাজকে কেবল আকস্মিকতার ফল বলে মনে করে তারা যদি হঠকারী আচরণ করতে বদ্ধপরিকর না হয়ে থাকে তাহলে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তাদের দিতে হবে। বিষয়টি হলো, একই ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্মের যে অনুপাত চলে আসছে তাতে কোথাও কোন যুগে এমন অবস্থা কখনো দেখা দেয়নি যে, কোন জনপদ ক্রমাগত শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীই জন্ম লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের বংশধারা টিকে থাকার কোন সম্ভবনাই থাকেনি। তাদের কাছে এরূপ না হওয়ার কি যুক্তি ও ব্যাখ্যা আছে? এ কাজটিও কি আকস্মিকভাবেই হয়ে চলেছে? এত বড় দাবী করার জন্য কোন মানুষকে অন্তত এতটা নির্লজ্জ ও বেশরম হওয়া চাই যাতে সে একদিন এ দাবীও করে বসতে পারে

যে, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো এবং পিকিং–এর মত শহর আকস্মিকভাবে আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর রূম, টীকা ২৭ থেকে ৩০; আশ্ শূরা, টীকা ৭৭)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্নের জবাবে কখনো بَلٰى (কেন সক্ষম নন), কখনো سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ فَبَلٰى (তোমার সত্তা অতি পবিত্র, হে আল্লাহ, কেন সক্ষম নয়) এবং কখনো سُبْحٰنَكَ فَبَلٰى অথবা سُبْحٰنَكَ وَبَلٰى বলতেন। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু দাউদ) আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা সূরা ত্বীনের আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন?) পড়বে তখন বলবে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (কেন নয়, আমি নিজেও এর একজন সাক্ষদাতা), সূরা কিয়ামাহর এ আয়াতটি যখন পড়বে তখন বলবে এবং যখন সূরা মুরসালাতের আয়াত فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (এ কুরআন ছাড়া আর কোন্ জিনিসের প্রতি তারা বিশ্বাস পোষণ করবে?) পড়বে তখন বলবে ঃ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি)। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী এবং হাকেমও অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।